মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অনিরুদ্ধ রায়
প্রাক্তন অধ্যাপক
ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশক
মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

প্রগতিশীল প্রকাশক
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

Scanned with CamScanner

দেখা যায়। দিল্লির *জামা মসজিদ* ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদে এটা আরো বেশি করা হয়েছিল। একমাত্র তাজমহলেই ছিল নিখুত মধ্যবর্তী পন্থা।

গম্বুজ নিয়ে পরিষ্কার কোন ধারণা যে আসেনি সেটা বোঝা যায় দিল্লি দুর্গের মধ্যে আওরঙ্গজেবের তৈরি *মোতি মসজিদ* থেকে। এর মধ্যে তিনটি ছোট ছত্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। শাহজাহান দুর্গের মধ্যে কোন মসজিদ করেন নি, কিন্তু আওরঙ্গজেব অন্য ধরনের লোক ছিলেন। উনি দিনে বা রাত্রে মসজিদে যাবার জন্য দুর্গের মধ্যে মসজিদ তৈরি করার আদেশ দেন এবং রাজার বাসস্থানের কাছেই এটি করা হয়েছিল। এটি মসৃণ মার্বেল পাথরের সৌধ এবং এর বাঁকগুলিও সংযত যার ফলে এর সৌন্দর্য কমেনি। কিন্তু তিনটি ছত্রী লাগানোর ফলে সমসাময়িক গম্বুজগুলির বৈশিষ্ট্যও হারিয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের আরো কয়েকটি স্থাপত্যকীর্তি উত্তরভারতের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে বারাণসীর মসজিদ যার কোন বৈশিষ্ট্য নেই ও মথুরার *জামা মসজিদ*। শেষেরটি ওয়াজির খানের সমাধির ইঁট ও টালীর ধাঁচের সঙ্গে পুরানো ঘরানার সংমিশ্রণ। দোতলা এই সৌধে নানারঙের টালী বসিয়ে ও বারকোণা মিনার তুলে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল স্থাপত্যশিল্প বিপর্যয়ের সামনে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অযোধ্যার নবাবরা ক্ষমতা পেয়ে স্থাপত্যশিল্পকে উৎসাহ দিয়ে নূতন ঘরানার সৃষ্টি করেন। দিল্লিতে শেষ মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায় ১৭৫৪ সালে তৈরি নবাব সফদরজং (অযোধ্যার নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র)-এর সমাধি। প্রায় দুশো বছর আগে হুমায়ুনের সমাধির সঙ্গে তুলনা করলে মুঘল স্থাপত্যশিল্পের পতন সহজেই চোখে পড়ে, যদিও সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিকায় সফদরজং-এর সমাধিসৌধ প্রায় বিস্ময়কর।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দুদের অধিকাংশ গোঁড়া হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা করতেন। কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে দুটি ধারা দেখা যায়। একদিকে হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা প্রচেষ্টা শুরু হয় আরো উদার মনোভাব নিয়ে আসার জন্য। অন্যদিকে গোঁড়ামীর কঠোরতা আরো বাড়তে থাকে। কয়েকজন বৈষ্ণবও তান্ত্রিক মহিলা ও শূদ্রদের অধিকার চাইতে থাকেন। এর সঙ্গে তাঁরা আদিবাসী, পাহাড়ী উপজাতি ও যেসব মুসলমান হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁদের হিন্দুধর্মের মধ্যে নিয়ে আসার কথা বলতে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণদের বড় একটা অংশ, বিশেষত যাঁরা ধর্মশাস্ত্র নিয়ে লিখেছেন, তাঁরা এর বিরুদ্ধতা করতে থাকেন। এঁরা হিন্দুধর্মের শুচিতা রক্ষা করার জন্য মুসলিম সম্প্রদায় থেকে দূরে থাকতে লাগলেন। এছাড়া হিন্দুধর্ম রক্ষা করার জন্য এঁরা হিন্দুদের ধর্মীয় জীবনযাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলী তৈরি করে দেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীধরের লেখা থেকে এই ধারা শুরু হয়ে যায় এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলি ধরে চলতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে এইসব লেখকরা অধিকাংশই হিন্দু রাজাদের

Scanned with CamScanner

রাজানুগ্রহ লাভ করার ফলে সমাজে এদের প্রভাব বেশি ছিল। কিন্তু এই ধরনের রাজাশ্রিত লেখক ছাড়াও অন্যরা ছিলেন, যাদের মধ্যে নদীয়ার রঘুনন্দন মিশ্র ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এর প্রভাব হিন্দু সমাজে স্থায়ী হয়ে যায়। রঘুনন্দন ব্রাহ্মণদের উচ্চাসনে বসিয়ে বিধান দেন যে তাঁরাই কেবল শাস্ত্র পড়া ও পড়ানোর উপযুক্ত। উনি বলেন যে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ছাড়া আর কেউ নেই। ক্ষত্রিয়রা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বৈশ্য ও অন্যান্যরা হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ঠিক মত পালন না করায় জাত খুইয়েছে।

রঘুনন্দনের *স্মৃতিকে* উৎসাহ দেন রাজা টোডরমল। তিনি একদল পণ্ডিতকে লাগিয়ে আইনের একটা 'এনসাইক্লোপিডিয়া' বের করেন, যার মধ্যে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার, দান, অর্থ ও ঔষুধ সবই আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতেও হিন্দু রাজন্যবর্গের উৎসাহে এই ধরনের কাজ চলতে থাকে।

কয়েকজন ব্রাহ্মণ, যাদের মধ্যে তুলসীদাস উল্লেখযোগ্য, শাস্ত্র মেনে চললেও একটা সমঝোতার পক্ষে ছিলেন। তুলসীদাস দাবি করেন যে নীচু জাতও মোক্ষ পেতে পারে যদি তারা ক্রমাগত রাম নাম জপ করতে থাকে এবং উনি ওদেরকে ব্রাহ্মণদের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। তবে উনি দুঃখ করেছিলেন যে শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ানো শুরু করেছে। তুলসীদাস জাতিভেদ প্রথা মানতেন, কিন্তু বিশ্বাস করতেন যে জন্মের ভিত্তিতে জাত নয়, কর্মের ভিত্তিতে জাত। ব্রাহ্মণরা ওঁর মতবাদ স্বীকার না করলেও, তুলসীদাসের প্রভাব উত্তর-ভারতে পরবর্তীকালে বিশাল হয়েছিল। মীরাবাঈ ও সুরদাস রাধা-কৃষ্ণের পূজা শুরু করলে মহিলাদের মধ্যে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভক্তি আন্দোলনের ফলে অব্রাহ্মণদের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এর বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করতে থাকে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের শূদ্র পর্যায়ে নামিয়ে আনে। দ্বাদশ শতাব্দীতে তাদের যে অধিকার ছিল সেগুলি দিতে তারা আর রাজী হয় না। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ বিষয় নিয়ে বড় গঙ্গালাই ও তেঙ্গলাইদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক শুরু হয়। তেঙ্গলাইরা বলতে থাকে যে শূদ্রদের মধ্যে সত্যিকার ভক্ত থাকলে তার মর্যাদা ব্রাহ্মণদের সমান হবে। এমনকি নীচু জাতের লোকদের কাছ থেকেও ধার্মিক জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। ১৫৯৬ সালের এক তাম্রপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে বৃদ্ধাচলমে এক শূদ্র পুরোহিত প্রচুর শূদ্র ভক্ত জোগাড় করেছে।

তেঙ্গলাইদের মতবাদ উত্তরভারতে প্রচলন করেন চৈতন্যের অনুগামী গোপাল ভট্ট। উনি ওঁর বই *হরিভক্তি বিলাসে, স্কন্দপুরাণ* থেকে উদ্ধৃত করে দেখান যে ব্রাহ্মণ ছাড়াও, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও মহিলাদের শালগ্রামশিলা পূজা করার অধিকার ছিল। সনাতন গোস্বামী *ভাগবৎপুরাণ* ও অন্যান্য বই থেকে উদাহরণ দিয়ে এটি সমর্থন করেন। সনাতন গোস্বামীর পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্ণাটকের ও তাঁর পিতামহ বাংলায় বসতি করেন। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের রীতিনীতির সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল, যা উনি ওঁর বইতে দিয়েছেন।

চৈতন্যের কয়েকজন অব্রাহ্মণ অনুগামী নীচু জাত এমনকি ব্রাহ্মণদেরও শিক্ষক হয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডের (বর্ধমান) নরহরি সরকার, জাতে বৈদ্য হলেও, বহু ব্রাহ্মণের গুরু

Scanned with CamScanner

ছিলেন। কায়স্থ নরোত্তম ঠাকুর ব্রাহ্মণদের দীক্ষা দিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রে তুকারাম, শূদ্র হলেও, কয়েকজন ব্রাহ্মণদের গুরু ছিলেন। আসামে শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব কায়স্থ হলেও ব্রাহ্মণ শিষ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ওর তীব্র বিরোধিতা করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে মাধবদেবের কয়েকজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ওঁর থেকে চলে গিয়ে আলাদা গোষ্ঠী গড়ে তোলে। ওদেরকে ব্রাহ্মণ গোঁসাই বলে বলা হত। এঁরা কঠোরভাবে জাতিভেদ প্রথা মানতেন এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ শিক্ষা দেবার উপযুক্ত নয় বলে ঘোষণা করেন। এরা অবশ্য শাক্তদের সঙ্গে সমঝোতা করেন কারণ ওঁরা ছাগলের, পায়রা ও হাঁসের মাংস খেতেন।

ব্রাহ্মণরা অবশ্য খুবই চেষ্টা করেন যাতে শূদ্ররা তাদের সুবিধা ও অধিকার না নিতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রে কমলাকার শূদ্রদের *পুরাণ* পড়ার অধিকার দিতে চাননি। কিন্তু রঘুনন্দনের মত তিনি শূদ্রদের রাম ও শিব মন্ত্র জপ করার অধিকার দিয়েছিলেন। শূদ্ররা ব্রত করতে পারে এবং ব্রাহ্মণদের দান করতে পারবে। রঘুনন্দন ও কমলাকার ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মর্যাদা না দিলেও, কেশব পণ্ডিত, যিনি শিবাজী থেকে রাজারাম পর্যন্ত, বিচার বিভাগে ছিলেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মর্যাদা মেনে নিয়েছিলেন। শিবাজীর সময়ে এ প্রশ্নটা সামনে আসে। গঙ্গা ভট্টর সাহায্যে শিবাজী মারাঠা ও অন্যান্য জাতদের তাদের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন। ১৬৭৭ সালের ২৪শে জানুয়ারি একটি রাজকীয় আদেশে শিবাজী নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেন। বৈশ্যদেরও উনি স্বীকৃতি দেন।

তন্ত্র ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে তফাৎ করেনি অন্তত ধর্মের ব্যাপারে। তান্ত্রিক *গায়ত্রী* ও সন্ধ্যার সব শ্রেণীর সমান অধিকার আছে বলে তারা বলে। সকলেরই তান্ত্রিক মন্ত্র পড়ার অধিকার থাকলেও, তারা জাতিভেদ প্রথা মানত। মধ্যযুগের গোড়ায় তান্ত্রিক প্রথার মধ্যে ভ্রষ্টাচার ঢুকেছিল, কিন্তু ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এগুলি বার করে দিয়ে শুদ্ধতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। আচার অনুযায়ী তান্ত্রিকদের তিনভাগে ভাগ করা হয় *দিব্য*, *বীর* ও *পশু*। এর সঙ্গে পঞ্চ মকারের প্রধান মর্ম বোঝানো হতে থাকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কয়েকজন তান্ত্রিক পণ্ডিত তন্ত্রের উপর লেখেন। ১৫৮৯ সালে বারাণসীর মাহীধর লেখেন। এর আগে ব্রহ্মানন্দ গিরি *তন্ত্র রহস্য* লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ওঁর শিষ্য পূর্ণানন্দ ১৫৭১ সালে বই লেখেন। ওঁর ছয় খণ্ড বইয়ের মধ্যে দর্শন ও যাদুবিদ্যা রয়েছে। সব থেকে বিখ্যাত ছিলেন নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যিনি *তন্ত্রসার* লিখেছিলেন। ১৬৮৭ সালে আন্দুল (কলকাতার কাছে) থেকে রঘুনাথ তর্কবাগীশ *আগম-তত্ত্ব-বিলাস* লেখেন। ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল তান্ত্রিকদের দুর্গ হয়ে যায়। অন্যান্য জায়গাতেও তন্ত্র নিয়ে লেখা হচ্ছিল।

শৈব ও শাক্তরা ছাড়াও বৈষ্ণবরাও তন্ত্র থেকে নিতে থাকে। বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামীর লেখায় এর আভাষ পাওয়া যায়। শাক্ত পীঠস্থান সাতটার বেশি ছিল না, কিন্তু তারা সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিল। ক্রমে এটি বেড়ে বাহান্নটি হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা পুঁথি থেকে জানা যায় যে এদের এক-তৃতীয়াংশই বাংলাতে ছিল। বাংলাতে শাক্ত ধর্মের জনপ্রিয়তা পরিষ্কার। মুকুন্দরাম বহুসংখ্যক শাক্ত পীঠ বাংলাতে ছিল বলেছেন।

Scanned with CamScanner

পণ্ডিতদের নানারকম চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মের নামে ব্যভিচার চলতে থাকে যার বর্ণনা দিয়েছেন বারাণসীর কাশীনাথ ভট্ট। উনি অবশ্য দাবি করছেন যে *বামাচারীদের* সরিয়ে *দক্ষিণাচারী* প্রথা উনি সুদৃঢ় করে যান। ভবভূতি ও রাজশেখর *অঘোরপন্থীদের* ব্যভিচারের নিন্দা করলেও, ঐসব আচার চলতেই থাকে। মহসীন ফানী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দবিস্তান-ই মজাহিবে* এই ধরনের নারকীয় আচারের বর্ণনা দিয়েছেন।

মুঘল যুগে শৈবদের মধ্যে নূতন কোন আন্দোলন হয়নি। মনে হয় হিন্দুদের বড় একটা অংশ শৈব ছিল। ষষ্ঠাদশ শতাব্দীতে আপ্পাইয়া দীক্ষিত বেদান্তের একেশ্বরবাদ ও শৈবধর্মের মধ্যে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলেন। *আগম* মতবাদের সঙ্গেও ওঁর এই প্রচেষ্টা ছিল। শঙ্কর-পার্বতী ও শঙ্কর-নারায়ণের ধারণাকে উনি মেলানোর চেষ্টা করেন। দক্ষিণ ভারতে সপ্তদশ শতাব্দীতে নায়কদের রাজ্যে এই মতবাদ চালানোর চেষ্টা হয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে কয়েকজন শৈব দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম রক্ষার জন্য আত্মাহুতি দিতে দ্বিধা করেনি। ১৫৯৭ সালে এক জেসুইট পাদ্রী, নিকোলাই পাইমন্তা এই ধরনের দৃশ্য দেখেছেন যখন তারা জিঞ্জির কৃষ্ণাপ্পা নায়কের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করছে।

বাংলাতে শৈবধর্ম সাধারণের কাছে একটা বড় পরিবর্তন এনেছিল। এই সময়ে উত্তরবঙ্গের কোচ উপজাতির দেবতার সঙ্গে রুদ্রশিবের এক করে দেওয়া হয়। মুকুন্দরাম কোচ মহিলাদের শিবপূজা করার প্রতি প্রবণতা উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য *শিবায়ণ* গ্রন্থে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। উনি শিবকে একজন কৃষক বলেছেন কারণ স্ত্রী পার্বতী তাঁর ছেলেদের ভিক্ষা থেকে খেতে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

আসাম, কুচবিহার ও ত্রিপুরাতে শক্তি পূজার প্রাধান্য ছিল যেখানে বিশেষ উৎসবে নরবলি হত। *হফত ইকলিমে* বলা হচ্ছে যে অহোমরা উপজাতীয় দেবী *আই* এর বার্ষিক উৎসবে নিজেদেরকে বলির জন্য উৎসর্গ করত। ঐ ধরনের লোকেদেরকে *ভোগী* বলা হত। যে দিন থেকে তারা নিজেদেরকে বলির জন্য উৎসর্গ করেছে সে দিন থেকেই তার সব কিছু করার অধিকারী হয়ে যেত। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর রাজা নরনারায়ণ কাম্যাখাতে একটা নূতন মন্দির স্থাপন করেন এবং প্রথম দিনে দেড়শ লোক নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। *রাজমালাতে* বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরার মহারাজা ধন্যমাণিক্য (মৃত্যু ১৫১৪) এক হাজার লোকের নরবলি প্রথা বন্ধ করেছিলেন। উনি আদেশ দেন কেবল দাগী আসামী ও বন্দীদের বলি দেওয়া হবে। অমরমাণিক্যের ছেলে ব্রাজ্যধর (মৃত্যু ১৬০৩) বৈষ্ণব হয়ে যান। উনি একটি বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে চব্বিশ ঘণ্টা কীর্তন হত। বলা হয় যে বীরভদ্রর ছেলে গোপীবল্লভ ত্রিপুরাতে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোবিন্দমাণিক্য কঠোর হাতে এই বলি প্রথা বন্ধ করেন।

শঙ্করদেব (জন্ম ১৪৮৭) কামরূপ ও কুচবিহারে বৈষ্ণবধর্ম নিয়ে আসেন। বলা হয় যে উনি অহোম রাজার হাত থেকে পালিয়ে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের কাছে আশ্রয়

Scanned with CamScanner

নেন। এখানে ওঁর ধর্মপ্রচার করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ওর সঙ্গে ছিলেন ওঁর শিষ্য মাধবদেব। পর্যটক ফিচ ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে কুচবিহারে গিয়ে বলেন যে এখানকার লোকেরা প্রাণীহত্যা করে না এবং পশুপাখীদের জন্য হাসপাতাল তৈরি করেছে। উপজাতিরাও বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং কাছারের হেরম্ব এলাকার উপজাতিরা বৈষ্ণব হয়ে যায়। মাধবদেব লিখছেন যে গারো, ভুটিয়া বা মুসলিমরা প্রথম হরির নাম নেয়। তবে অন্যান্যরা যে *হরিনামের* সমালোচনা করছে সে কথাও বলেছেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হলেও, অধিকাংশই বিরোধিতা করতে থাকে। রাজা রুদ্রসিংহ (মৃত্যু ১৭১৪) শূদ্রদের বাধ্য করেন গলাতে একটা কালো কাপড় পরতে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা মনে করেছেন যে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের অনুগামী চৈতন্যের অনুগামী। কিন্তু ওদের মধ্যে চারটি মূল ফারাক রয়েছে। শঙ্করদেব মূর্তিপূজা মানতেন না কারণ ভগবান কায়াহীন। দ্বিতীয়ত, শঙ্করদেবের কাছে মোক্ষই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তৃতীয়ত, শঙ্করদেব রাধাকে কোন স্বীকৃতি দেননি। চতুর্থত, আসাম বৈষ্ণবরা চার নাম জপ করে *রাম কৃষ্ণ* থেকে। বাংলার বৈষ্ণবরা ষোল নাম জপ করে *হরে কৃষ্ণ* থেকে। শঙ্করদেবের প্রধান জায়গা ছিল *সাত্রা*, যেখানে *নামঘরে* গীতা বা ভাগবৎ রাখা থাকত।

শঙ্করদেব ও মাধবদেবের মৃত্যুর (১৫৯৬ সাল) পর ওঁদের অনুগামীরা বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটা কারণ হয়ত ছিল যে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে কিছু তান্ত্রিক আচার ঢুকেছিল। উত্তর আসামে কয়েকটা নূতন আখড়া খোলা হয় এবং কোন কোন জায়গায় গোবিন্দদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৫৪৬ সাল থেকে ১৫৫০ সালের মধ্যে নিত্যানন্দের শেষ শিষ্য বৃন্দাবন দাসের লেখা থেকে বোঝা যায় যে চৈতন্যের অনুগামীদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এবং আলাদা ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। অদ্বৈতবাদীরা যারা কৃষ্ণকে অদ্বৈত বলছে তাদের সঙ্গে গঙ্গাধরের অনুগামীদের পার্থক্য বাড়তে থাকে। ছয় গোস্বামী বৃন্দাবনে বৈষ্ণব মতাদর্শ ও দর্শন পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। এদের সঙ্গে ছিলেন রূপ, সনাতন ও তাঁদের ভাইপো জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্টাচার্য ও রঘুনাথ দাস। এরা চৈতন্যের থেকে তাঁদের মতাদর্শ নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা একই সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণেরও পুজো করতেন। এদের কাছে চৈতন্যই শেষ লক্ষ্য নয়, মাধ্যম মাত্র। গোপাল ভট্টর শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য এদের কাজ বৃন্দাবন থেকে বাংলাতে নিয়ে আসেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরকে বৈষ্ণবধর্মে নিয়ে আসতে সমর্থ হন।

বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরে কতকগুলি অসাধারণ বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীনিবাস আচার্যের তাঁর দান কবিতায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু দেখা যায় উনি অন্তত ১৬০৮ সাল পর্যন্ত কখনো মুঘলদের পক্ষে ও কখনো তাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করে গিয়েছেন। শ্রীনিবাসের দুই সহযোগী, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ বাংলা ও উড়িষ্যাতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। নরোত্তম বাংলার বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠীকে এক জায়গায় এনে সমন্বয় করার

Scanned with CamScanner

জন্য ১৫৮৬ সালে খেতুরীতে মহাউৎসব করেন, যেখানে রাধা-কৃষ্ণ ও চৈতন্য ও তাঁর দুই স্ত্রীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ উপলক্ষ্যে নরোত্তম *গড়ানহাটি* ধরনের কৃষ্ণ সঙ্গীত শুরু করেন। নিত্যানন্দের বিধবা স্ত্রী জাহ্নবী দেবীকে নেত্রী বলে মেনে নেওয়া হয়। ওঁর নির্দেশেই বৈষ্ণব আচার ব্যবহার চলতে থাকে। উনি তিনবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন যেখানে ওঁকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। অদ্বৈত আচার্যের স্ত্রী সীতাদেবী পর্দা ছেড়ে বাইরে আসেন নি, কিন্তু উনি একটা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন যেখানে পুরুষরা মহিলাদের পোশাক পরত। বুখানন হ্যামিলটন বলছেন যে গৌড়ের কাছে জঙ্গলীটোলাতে বৈষ্ণবদের যে আখড়া ছিল সেটার প্রতিষ্ঠা করেন সীতাদেবী। উনি দুজন পুরুষ শিষ্যও করেছিলেন।

ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতকের শেষে জানা যায় ৪৯০ জন চৈতন্যের প্রধান অনুগামীদের মধ্যে ২৩৯ জন ব্রাহ্মণ, ৩৭ জন বৈদ্য ও ২৯ জন কায়স্থ ছিল। কিন্তু সাধারণ বৈষ্ণবদের অধিকাংশই ছিল অন্য জাতের যারা থাকত প্রধানত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে। নীচু জাতের লোকেদের চৈতন্য সামাজিক মর্যাদা দেওয়ায় ধনী সুবর্ণবণিকরা বৈষ্ণব হয়েছিল। এদেরকে বল্লভাচার্য নীচু জাতের মধ্যে ফেলেছিলেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল জাত শাক্ত রয়ে গেল। অনেক প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরাও শাক্ত মত ছাড়েনি। বৈষ্ণব সাহিত্যে উঁচু জাতের শাক্ত থেকে বৈষ্ণব হওয়া পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম বলে ধরা যায়। বাংলার নামকরা কবিরা যেমন ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম ও রূপরাম চক্রবর্তী বা কায়স্থ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে ভালো কথা বলেছেন। শাক্ত এবং শৈবরা মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী ইত্যাদি দেবীকে প্রণাম জানিয়েছেন। এমনকি ধর্ম ঠাকুরকেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিছু বৌদ্ধ সহজিয়া বৈষ্ণব সহজিয়া হয়ে যায় ও তাদের লেখা সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যাতে ব্রাহ্মণরা অনেক বেশি শক্তি ও শিব-এর ভক্ত ছিলেন কিন্তু বৈষ্ণব অনুগামী কিছু ছিল যেটা বোঝা যায় রেমুনার গোপীনাথ মন্দির ও আলাইনাথের জনার্দন মন্দির থেকে। এরা সম্ভবত চৈতন্য আসার আগে থেকেই বৈষ্ণব হয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখা থেকে বোঝা যায় যে সাধারণ লোক ও জমিদাররা মদ ও অন্যান্য ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন। এরা কীর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং গ্রাম থেকে বৈষ্ণবদের তাড়িয়ে দেন। চৈতন্যের সময়েই বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ এগোতে পারেনি। উড়িষ্যার পাঁচজন কবি, *পঞ্চশাখা* নামে খ্যাত, লিখেছেন যে তারা নাচের সঙ্গে কীর্তন গান গেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের লেখা থেকে বোঝা যায় যে তারা আধা-বৌদ্ধ এবং ওদের মতাদর্শের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণবদের মূল তফাৎ রয়েছে। পরে শ্যামানন্দ ও তাঁর শিষ্য রসিকানন্দ উড়িষ্যাতে বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয় করে তোলেন।

ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণববাদের ঢেউ উত্তরভারতে চলতে থাকে। এটা ছিল অনেক বেশি ভক্তিমূলক। বল্লভাচার্য গোষ্ঠীর মতে বারাণসী ও প্রয়াগের মধ্যে সবটা এলাকাই ছিল শাক্ত। এর পরে শুধু এই এলাকাতে পরিবর্তন আসে তা নয়, সমস্ত উত্তরভারতেই এই

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বল্লভাচার্যর অনুগামীরা হিত হরিবংশ, হরিদাস স্বামী, শ্রীভট্ট ও তুলসীদাস এই পরিবর্তন নিয়ে আসেন।

বল্লভাচার্যের ছেলে ভিট্টল (১৫১৬-১৫৭৬ সাল) ওঁর দয়ার মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান। ভিট্টল সঙ্গীতের সঙ্গে দিনে আটবার মূর্তি পুজো চালু করেন। ভিট্টলের মতে রাধার মধ্য দিয়েই মোক্ষ লাভ সম্ভব। উনি বহু শিষ্য করেন যারা ঘুরে ঘুরে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমসঙ্গীত গাইতে থাকে। ভিট্টল রাজস্থান ও গুজরাটের বহু জায়গায় ঘুরে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। উনি বহু শিষ্য করেন যার মধ্যে আড়াইশো প্রভাবশালী ছিল। এদের মধ্যে সুরদাস (মৃত্যু ১৫৮১ সাল) খুব নাম করেছিলেন রাধা-কৃষ্ণর প্রেমলীলা নিয়ে লিখে। হিতহরিবংশ (মৃত্যু ১৫৫৩ সাল) রাধা-বল্লভী ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬২৬ সালের স্তম্ভের গায়ে একটা তারিখ থেকে অনুমান করা হয় যে বৃন্দাবনে রাধা-বল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল (মতান্তরে ১৫৮৫ সাল) গোবর্ধনে হরিদেব মন্দিরের অনুকরণে। মহসীন ফানী বলেছেন যে রাধা-বল্লভীরা তাদের গুরুদের জন্য তাদের স্ত্রীদের দিত। কিন্তু উনি বল্লভাচার্য ধর্মমতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন, যেখানে এই মতবাদ ছিল। হরিদাস স্বামী আর একটি বৈষ্ণব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বলা হয়। এও বলা হয় যে উনি সঙ্গীতজ্ঞ তানসেনের গুরু ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পণ্ডিতরা হরিদাসের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায়।

তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩) রাম মতের প্রচলন করেন। উনি কোন গোষ্ঠী বা মতবাদ কিংবা মন্দির তৈরি করেন নি। কিন্তু ওঁর *রামচরিত মানস* হিন্দি ভাষাভাষী সাধারণ লোকেদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। উনি আরো এগারোটা বই লিখেছেন। মহসীন ফানী বলছেন যে রাম অনুগামীরা অত্যন্ত নির্মল চরিত্রের লোক।

ষষ্ঠদশের শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার পশ্চিম ভারতে জ্ঞানেশ্বরের সময় থেকে ভক্তি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ১৫৭২ সালে একনাথ তাঁর *ভাগবৎ পুরাণের* উপর লিখে বিখ্যাত হয়ে যান। ওঁর কাজ মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একতা এনে দেয়। উনি নিজে ব্রাহ্মণ হলেও বলেছেন সব জাতের সমান অধিকার আছে ধর্মীয় ব্যাপারে এবং স্থানীয় ভাষাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা যখন কলি যুগকে নিন্দা করছে তখন তিনি কলি যুগের প্রশংসা করেছেন। একদিক থেকে চৈতন্যের মতের সঙ্গে ওঁর মতবাদের খুব মিল ছিল এবং একনাথের প্রভাব সব শ্রেণীর উপর পড়েছিল।

মহারাষ্ট্রে ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তুকারামকে (১৬০৮-১৬৪৯ সাল) ধরা হয়। উনি ছিলেন রামভক্ত এবং কীর্তনের সঙ্গে ওঁর ভজনা করতেন। তুলসীদাসই গানগুলির সৃষ্টি করেন। উনি বলতেন যে কেবল ভক্তিতেই ভগবানকে পাওয়া যায়। ওঁর সঙ্গে চৈতন্যের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল যে কথা ওঁর শিষ্যা বাহিনী বাঈ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গিয়েছেন। তুকারামের গানগুলির সঙ্গে চৈতন্যের কয়েকটি পদের মিল পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

এক নূতন রাম মতবাদের উদয় হয় যখন এক ধুনুরী দাদু এটি আহমেদাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন। আকবরের শেষদিকে উনি আসেন। ওঁর অনুগামীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল— সন্ন্যাসী, সৈন্য ও গৃহী। রামের আর এক ভক্ত রামদাস (১৬০৮-১৬৮১ সাল) ছোট একটা গোষ্ঠী গঠন করেন। কিন্তু ওঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল খুব বেশি এবং মহারাষ্ট্রে প্রচার বা মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই গুলির মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গে মন্দির যুক্ত ছিল। উনি ও ওঁর শিষ্যরা বহু জায়গায় ঘুরে রামনাম প্রচার করে বেড়ান। শিবাজী ওঁর শিষ্য হয়ে মঠগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু অর্থ দেন। ১৬৮২ সালের এক চিঠিতে শিবাজী ওঁর গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাঁর অবদানের জন্য। কিন্তু ওঁর প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী বেশিদিন চলেনি। তুকারাম প্রতিষ্ঠিত পান্ধারপুর আন্দোলন বহুদিন টিকেছিল।

গুজরাটে শাক্ত ও শৈবধর্মের প্রচলন ছিল ভালো। মুঘল যুগে বৈষ্ণবধর্ম জায়গা নিতে থাকে। বল্লভাচার্যের মতবাদ এখানে প্রাধান্য পেতে থাকে প্রধানত ব্যাপারী ও কৃষকদের মধ্যে। গোপালদাস তাঁর বই *বল্লভ আখ্যানে* পরিষ্কারভাবে মতাদর্শ বুঝিয়ে দেন। এটি গুজরাটিতে লেখা হয়।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম মুসলমানদের ছোঁয়া অস্পৃশ্যতা বলে দূরে সরিয়ে রাখলেও, বৈষ্ণবরা মুসলিমদের ডেকে নিয়েছিল। চৈতন্য হরিদাস যবন ছাড়া আরো কয়েকজন পাঠানকে বৈষ্ণব করেছিলেন। বৈরাগীরা যে হিন্দু-মুসলিম তফাৎ করে না এটা মহসীন ফানি বলেছেন সপ্তদশ শতাব্দীতে। ১৬৪২ সালে উনি লাহোরে নারায়ণ দাসের দেখা পান যাঁর অনেক মুসলমান শিষ্য ছিল। উদারনীতির ধারা যে উত্তরভারতে চলেছিল আকবরের দরবারের বহু ঘটনায় বোঝা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি মতবাদ গড়ে উঠে যারা হিন্দু-মুসলমান একতার কথা জোর দিয়ে বলছিল। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে দাদু পরমব্রহ্ম সম্প্রদায় তৈরি করেন যারা হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মকে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে এক করতে চেয়েছিলেন। ওঁর দুজন শিষ্য ১৬৪৮ সালে দারা শুকোর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন যার বর্ণনা একটা ফার্সী পুঁথিতে রয়েছে। আর একজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রাণনাথ বুন্দেল রাজা ছত্রশালকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন এবং একটা বই লেখেন যেখানে উনি পাশাপাশি কোরান ও বেদ থেকে উদ্বৃত করে দেখাচ্ছেন যে ওদের মধ্যে কোন ফারাক নেই। উনি ওঁর হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যদের নিজেদের ধর্মের আচার-বিচার অনুসরণ করার আদেশ দেন।

এই ধরনের উদার সাধু-সন্ত আরো এসেছিলেন। এদের মধ্যে এক মাংস বিক্রেতা সাধন গান গেয়ে শালগ্রাম শিলা পূজা করতেন। তাঁর দুটো গান *গ্রন্থ সাহেবের* মধ্যে আছে। রাজস্থানের মেও উপজাতির মধ্যে থেকে আসেন লালদাস যিনি আচার-বিচার মানতেন না। এই বিভিন্ন হিন্দু মতবাদগুলি একে অন্যদের প্রতি সহনশীল ছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য চূড়ান্ত গোলমালের কথা পাওয়া যায়। ১৬৪০ সালে হরিদ্বারে নেড়া বৈরাগীদের সঙ্গে নাগা সন্ন্যাসীদের প্রচণ্ড গোলমাল হয়। কুম্ভ মেলা উপলক্ষ্যে কারা আগে স্নান করবে তাই নিয়ে গোলমাল হয়। কয়েকজন বৈরাগী মারা যায়।

Scanned with CamScanner

শিখ ও অন্যান্য ধর্ম

নানকের প্রচারের মাধ্যমে শিখধর্ম আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গুরুবাদের সঙ্গে এটা জড়িয়ে ছিল। প্রথম চারজন গুরু জ্ঞানার্জন ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে কাটালেও, পঞ্চম গুরু অর্জুন দাস *আদি গ্রন্থ* বা গ্রন্থ *সাহেব* শেষ করেন। এঁর সময় থেকেই উনি ধর্মীয় ও জাগতিক নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। মধ্যএশিয়া থেকে ভালো ঘোড়া সংগ্রহ করেছিলেন, বহু অনুচর রেখেছিলেন এবং অমৃতসরে বহু ভালো সৌধ তৈরি করেন। সব শিখদের কাছ থেকে তাদের আয়ের এক-দশমাংশ দান হিসাবে সংগ্রহ করেন।

পরবর্তী গুরুরা গুরু নানকের মূল ধর্মমতকে উপেক্ষা না করে একে আরো বাড়িয়ে তুললে একটা নূতন দিক চলে আসে। এক গুরুর ধারণার সঙ্গে যোগ হয় গুরুর দপ্তর যার সিদ্ধান্তকে অবহেলা করা যায় না। একই সময়ে শিখদের সমবেত জনমতকে (*সঙ্গত*) আরো গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। এর সঙ্গে যে আচার-অনুষ্ঠান যোগ হয় তার ফলে শিখরা একটা আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে ওঠে, যার ফলে সবরকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা এক হয়ে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিখ ও মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষের বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। একদিকে মুঘলদের বিরুদ্ধচারণ ও অন্যদিকে ভক্তি-আন্দোলন শিখ আন্দোলনকে বাড়তে সাহায্য করেছিল। তবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি আনা, জাতিভেদ প্রথা দূর করা ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে এরা ছিল। নানক পাঁচটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন—নামগান, দান, স্নান, সেবা এবং *সিমরান* বা আত্মার মুক্তির জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা। তবে ওঁর সঙ্গে অন্যান্য সংস্কারবাদী সাধুদের কয়েকটি তফাৎ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপরে একটা অন্ধ বিশ্বাস হতে থাকে প্রধানত শিক্ষার উন্নতি না হবার ফলে। এর ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে নানান ধরনের কুসংস্কার চলতে থাকে। কয়েকজন সাধু যেমন বুন্দেলখণ্ডে প্রাণনাথ, গুজরাটে শান্তিদাস ও স্বামী নারায়ণ, বাংলাতে রামপ্রসাদ সেন ও উড়িষ্যাতে বিদ্যাভূষণ হিন্দু ধর্মকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। গোলমালও ছিল। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভয়ে বৈষ্ণবরা জঙ্গলের মধ্যে চৈতন্যের মূর্তি লুকিয়ে রাখে। ১৭২৯-৩০ সালে নাগা সন্ন্যাসীদের আক্রমণে কয়েক হাজার বৈষ্ণব বৈরাগী মারা যায়। পেশোয়া অবশ্য উদারনীতি গ্রহণ করে সব ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সাহায্য করেছেন যাদের মধ্যে মুসলমানরাও ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু সাধুসন্তদের জীবনী লেখা হতে থাকে। ১৭১২ সালে হিন্দিতে প্রিয়দাসজী *ভক্তিমালার* টিকা লেখেন। এর মধ্যে বহু সন্তের জীবনী লেখা হয়েছিল। বাংলাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় নরহরি চক্রবর্তী *ভক্তিরত্নাকর* ও *নরোত্তমবিলাস* লেখেন। মারাঠা সাধু ভানুদাসের পৌত্র মহিপতি বহু জীবনী লেখেন। এইসব বই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। গুজরাটে শাক্ত সাধু ও ধার্মিকদের নিয়ে বল্লভভাই ও অন্যান্যদের রচনা পাওয়া যায়। বল্লভভাই গরবা সঙ্গীত রচনা করেন যা গুজরাটের সব জায়গাতেই বহুদিন

Scanned with CamScanner

পর্যন্ত গীত হত। বৈষ্ণবদের সঙ্গীতে কোমল মনোভাব ও আত্মসমর্পণ ছিল যা সাধু শান্তিদাসের লেখায় পাওয়া যায়। উনি রামসানেহি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। গুজরাটে সংস্কারপন্থী সবথেকে বড় সাধু ছিলেন স্বামী নারায়ণ। ওঁর গুরু ছিলেন রামানন্দ যিনি বহু জায়গা ঘুরে কাথিওয়াড়ে বসতি করেন। স্বামী নারায়ণকে ভগবানের অবতার বলে মনে করা হত ১৮০৪ সাল নাগাদ। উনি আহমেদাবাদে বসতি করলে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা ওঁর পিছনে লাগে। উনি ওখান থেকে সরে ওয়াতালে গিয়ে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন লক্ষ্মীনারায়ণের। উনি সতীদাহ, পশুহত্যা, শিশুহত্যা এবং ভ্রষ্টাচার বন্ধ করার বহু চেষ্টা করেছিলেন। ওঁর *সৎসঙ্গে* বহু লোক যোগ দেয় এমনকি উপজাতিদের মধ্য থেকেও এসে ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দলিত ও অস্পৃশ্যদের উনি অনুষ্ঠানে এক পাশে বসার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে উনি অত উদার ছিলেন না।

আমরা আগেই দেখেছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে পান্নার প্রাণনাথ দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে কোরান ও বেদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নেই। উনি আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত জানতেন এবং চোদ্দটা বই লিখে গিয়েছেন। অযোধ্যার জগজীবন দাস, ক্ষত্রীয়, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি আনার চেষ্টা করেছিলেন। উনি এক সূফির শিষ্য ছিলেন এবং ১৭৬১ সালে হিন্দিতে *জ্ঞান প্রকাশ* বলে একটি বই লেখেন। উনি *সৎনামী* গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন যদিও ঐ নামে একটি গোষ্ঠী সপ্তদশ শতাব্দীতেই ছিল। এরা একেশ্বরাবাদে বিশ্বাস করলেও রাম ও কৃষ্ণমূর্তির ভজনা করত। এদের অনুগামীদের দিল্লি, কানপুর, মথুরা, বারাণসী, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ ও গুজরাটে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর প্রদেশের এক রাজপুত, শিব নারায়ণ, একটা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করে যারা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি আনার উদ্যোগ নিয়েছিল। এই দুটি সম্প্রদায় ছাড়াও খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকেও শিষ্য নেওয়া হত। ১৭৩৫ সালে ওঁর লেখা বই পাওয়া যায়। শিব নারায়ণ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। মাংস খাওয়া ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিলেন। রোটক জেলার গরীবদাস (১৭১৭-১৭৭৮ সাল) একটা ছোট গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর শিষ্যরা ভগবানকে রাম, হরি ও আল্লার নামে পুজো করত। উনি শিষ্যদের সব অনুষ্ঠান বর্জন করে ভক্তি ও প্রেমের জীবনযাপন করতে বলেন। উনি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছিলেন। এই ধরনের কথা আলোয়ারের চরণদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বলেছিলেন। পরবর্তীকালে ওঁর অনুগামীরা তুলসী ও শালগ্রাম শিলা পূজা করতে শুরু করে যাতে অন্যান্য বৈষ্ণবরা ওদের উপর বিরূপ না হয়। এদের প্রধান অনুগামীরা ছিল বণিক ও ব্যাপারী এবং এরা দিল্লি ও উত্তরদোয়াবে কেন্দ্র বসায়। ওঁর পরে ওঁর বোন শাহজী বাঈ ওঁর জায়গায় আসেন। উনি শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন এবং সঙ্গীত ও বই রচনা করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে পল্টুদাস এক নূতন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এরা ছিল অযোধ্যায় এবং এরা মূর্তি পূজা করত না। ১৭৪৭ সালে রামশাহজী হিন্দীতে রামের উপর

Scanned with CamScanner

বই লিখলে রামভক্তদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এদের তীর্থ ছিল উদিপীতে। এর পরে বহু উপগোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায়, যার মধ্যে রসিক উপগোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। একই সঙ্গে উপজাতি ও গ্রাম্য দেবতার পূজা চলতে থাকে প্রধানত মহারাষ্ট্র ও বাংলাতে। এগুলি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দলিত ও অস্পৃশ্যদের আলাদা দেবী পূজা ছিল। ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠান চলতে থাকে।

ইসলাম ধর্ম

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বিভিন্ন সূফি মতবাদ ভারতের নানান জায়গায় কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়, যাদের মধ্যে প্রধান ছিল চিস্তি গোষ্ঠী। কিন্তু ভারতে ইসলামের মধ্যে গোঁড়া ধর্মমত ও উদারনীতির একটা লড়াই বরাবর চলতে থাকে যেটাকে অনেক সময়েই *শরিয়ত* ও *তারিকাত* (সূফি মতবাদ) বলে ধরা হয়। এটা অবশ্য শুরু হয় পশ্চিম এশিয়াতে এবং ভারতে এটা চলতে থাকে। বলা প্রয়োজন যে ভারতে সূফি মতবাদ অনেক সময়েই হিন্দু মতবাদ নিয়েছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাংলাতে সূফিরা স্থানীয় বিশ্বাস নিতে থাকে। সুলতানী দরবারে উলেমারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ও অ-মুসলমান আচার গ্রহণ না করার পক্ষে ছিলেন, ফলে কোন ইসলামীয় ধর্মীয় আন্দোলন হিন্দু মতবাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে গেলে সরকারি উলেমারা তার বিরুদ্ধে চলে যেতে থাকে।

আকবর সব সৃষ্টির মধ্যে একতার মতবাদকে সমর্থন করতেন। বহু সূফিও এই মতবাদ সমর্থন করে। কিন্তু গোঁড়া মতাবলম্বী এক গোষ্ঠী এর বিরুদ্ধাচরণ করে এই বলে যে তাহলে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সৃষ্টির কোন তফাৎ থাকছে না। কাদিরিয়া মতবাদের নেতা শেখ আবদুল হক শরিয়তকে পুনরুজ্জীবিত করার উপর জোর দিতে থাকেন। আকবরের উদারনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তুর্কি বাকি বিল্লা দিল্লিতে এসে আন্দোলন শুরু করেন। উনি ছিলেন গোঁড়া নাসকবন্দি সূফি গোষ্ঠীর এবং দিল্লিতে আসার পর আকবরের দরবারের বহু নেতৃস্থানীয় অভিজাত ওঁর শিষ্য হন। ওঁর পরে ওঁর জায়গায় নেতৃত্ব দিতে থাকেন সিরহিন্দে শেখ আহমদ। ইনি প্রথমেই সব সৃষ্টির মতে একতা রয়েছে এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলতে থাকেন। সূফি মতবাদ থেকে যেসব আচার ও মত ইসলামীয় নয় বলে উনি মনে করছেন সেগুলি বাদ দিতে থাকেন। ধর্মীয় সঙ্গীত, রাত্রি জাগরণ, সাধুসন্তদের সমাধিতে যাওয়া উনি ইসলামীয় আচার বলে মনে করতেন না। হিন্দুদের কাছ থেকে যেসব আচার-অনুষ্ঠান এসেছে সেগুলির উনি নিন্দা করতেন এবং যেহেতু হিন্দুরা পশুর থেকেও অধম সেহেতু তাদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক না রাখার উপদেশ দিতে থাকেন। আকবর কেন অ-মুসলমানদের এত সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন তার সমালোচনা করে তিনি চান *জিজিয়া* আবার চালু করতে ও গো-হত্যা শুরু করতে। ওঁর নীতি চালু করার জন্য উনি অভিজাতদের চিঠি লিখতে থাকেন ও প্রচার করার জন্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। সুন্নী ইসলাম থেকে শাসককে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য একই সঙ্গে উনি উলেমাদের ও সূফিদের, যারা জাগতিক

Scanned with CamScanner

সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, তাদের দায়ী করেন। উনি নিজেকে *মুজাহিদ* বলে বর্ণনা করে দাবি করলেন যে ভগবান ওঁকে বিশুদ্ধ সুন্নী ইসলাম আনার জন্য পাঠিয়েছেন।

গোঁড়া মতাবলম্বীদের নিন্দা করার ফলে তারা ওঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। তারা বলতে লাগল যে উনি নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে যে দাবি করেছেন সেটা হজরত নবীর মর্যাদার সমান। কারণ একটা চিঠিতে শেখ আহমদ জানান যে উনি ভগবানের শিষ্য ও তাঁর ইচ্ছা। এই অভিযোগে জাহাঙ্গীর ওঁকে বন্দী করে রাখেন। শাহজাহান ওঁর ছেলেদের প্রতি কোন দৃষ্টি দেননি। ওঁর ছেলেরা আওরঙ্গজেবের নীতি যা ছিল অ-শরিয়তী সব আচার বন্ধ করার পক্ষে, সমর্থন করেছিল। আওরঙ্গজেব অবশ্য মুজাহিদকে সমর্থন জানান নি। পাঞ্জাব ও অন্যান্য জায়গার বহু উলেমারা মুজাহিদের এ চিঠিকে অ-ধার্মিক বলে *ফতোয়া* দেন। ১৬৮২-৮৩ সালে মক্কার শেরিফ আওরঙ্গজেবকে লিখে জানান যে মক্কার উলেমারা মনে করছেন যে শেখ আহমদ অবিশ্বাসী। এর ফলে আওরঙ্গজেব *মুজাহিদের* চিঠি থেকে প্রচার বন্ধ করে দেন বিশেষত আওরঙ্গাবাদে যেটি একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

পাঞ্জাবে কাদিরিয়া গোষ্ঠীকে জনপ্রিয় করেন শেখ আবদুল কাদির যাঁর ছেলেরা আকবরের নীতির সমর্থন করেছিল। এদের মধ্যে মিয়াঁ মীর সূফির মধ্যে আধ্যাত্মবাদের কথা বলেন। তিনি লাহোরে বসতি শুরু করলে বহু লোক আসতে থাকে। ওঁর বিখ্যাত শিষ্য মুল্লা বাদাকাশানী গোঁড়া মুসলমানদের হিন্দুদের অবিশ্বাসী বলার পক্ষপাতী ছিলেন না। ওঁর মতে যেসব হিন্দু সত্য উপলব্ধি করেছে তারাই বিশ্বাসী। কোন মুসলমান যদি সত্য উপলব্ধি না করে সেও অবিশ্বাসী। ১৬৩৯-৪০ সালে দারা ও জাহানারা মিয়াঁ মীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দারা সূফি ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন এবং ধার্মিক লোকেদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ওঁর উৎসাহে ও বারাণসীর পণ্ডিতদের সাহায্যে উনি গীতা ফার্সীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর বড় কাজ ছিল বেদের সংগ্রহ ফার্সীতে অনুবাদ করানো (*মাজমা-উল বাহরিন*)। এর ভূমিকায় দারা একে স্বর্গীয় বই বলে আখ্যা দিয়ে কোরানের সমান বলেছেন। এতে দেখানো হয়েছে যে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মূল কোন তফাৎ নেই। অবিশ্বাসীদের সঙ্গে ইসলামের কোন তফাৎ না করার জন্য উলেমারা ওঁর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসার পর ধর্মীয় পড়াশোনা ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হতে থাকে। একদল পণ্ডিতকে দিয়ে উনি *ফতোয়া-ই আলমগিরী* তৈরি করেন। এর সঙ্গে ছিল ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে যে ভারতে ও বিদেশে *ফতোয়া* দেওয়া হয়েছিল তার সংকলন।

নাসকবন্দি গোষ্ঠীকে গোঁড়া ও কাদিরিয়াদের উদার বলে সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু এরকম তফাৎ সব সময়ে করা যায় না। কাদিরিয়া গোষ্ঠীর আবদুল হক গোঁড়া ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মীর্জা মজহর (নাসকবন্দি গোষ্ঠী) সিদ্ধান্ত নেন যে বেদ প্রকাশিত বই যেখানে সত্য উপলব্ধি করা হয়েছে। এর ফলে উনি হিন্দুদের *আহলী কিতাবের* মর্যাদা দেন এবং ওদেরকে অবিশ্বাসী বা কাফের বলা যাবে না। আওরঙ্গজেবের সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা এগিয়ে গেলেও, উদারনৈতিক ধারার অবনতি হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সূফিদের

Scanned with CamScanner

মধ্যে গোঁড়া ও উদার মতবাদ চলতে থাকে। চিস্তি গোষ্ঠী আবার ফিরে আসতে থাকে। অনেক লোকই একাধিক গোষ্ঠীতে যোগ দেয় যার ফলে একটা উদারনৈতিক ধারণা চলতে থাকে। আওরঙ্গজেবের ছেলেরাও সুফিদের উদারনৈতিক ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

ইসলামীয় ধর্মের মধ্যে ভারতে গোঁড়া ও উদারনৈতিকদের সংগ্রাম বারে বারে মোড় নিয়েছে। একদিক থেকে দেখলে এটা ছিল জাগতিক ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগকারীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের উদার মনোভাবের লড়াই যেটা অনেকখানি নির্ভর করত সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। দু'ধরনের মতবাদই তখনকার অভিজাত ও সাধারণ লোকেদের উপর প্রভাব ফেলেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে ধরা হয় মধ্যযুগীয় ইসলাম থেকে আধুনিক ইসলামে রূপান্তরিত হওয়ার পালা যার সাঁকো হয়েছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২ সাল)। সংস্কৃতিবান মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সহপাঠী ছিলেন নেজ-এর আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৮৭), যাঁর মতবাদ নিয়ে ১৮০৪ সাল থেকে ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ঐতিহাসিক মারে টাইটাস অবশ্য ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্যে ওয়ালিওল্লার অবদান ছিল মানেন নি। ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু হবার সময়ে পূর্ব বাংলায় ফারাইজী গোষ্ঠীর আন্দোলন করেন হাজী শরিয়তউল্লা। ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের জনক ছিলেন রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১ সাল), যিনি ওয়ালিওল্লার ছেলে আবদুল আজিজের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শাহ ওয়ালিওল্লার মতবাদও ওঁকে উৎসাহ দেয়। আবদুল ওয়াহাব ও শাহ ওয়ালিওল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল একই, শুদ্ধ ইসলাম নিয়ে এসে মুসলমান সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং এদের দুজনের মধ্যে মূলত কোন ফারাক ছিল না। কিন্তু ওয়ালিওল্লার ইসলাম অনেক বেশি ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ যার মধ্যে সূফি উপাদান থাকার ফলে অনেক বেশি নমনীয়। ওঁর ইসলামের মধ্যে সুন্নীরা ছাড়াও শিয়াদের জায়গা ছিল যেটা ওয়াহাবীদের মধ্যে ছিল না।

আবদুল ওয়াহাবের মত ওয়ালিওল্লা মূলত গোঁড়া সুন্নী মতবাদকে নূতনভাবে জাগাতে চেষ্টা করেন এবং এজন্য উনি হানাফি মতবাদ না নিয়ে মালিকী মতবাদের উপর জোর দিতে থাকেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকলে ওয়ালিওল্লার সুবিধা হয়। মুঘল রাজত্ব যখন মধ্য গগনে তখন কাজীরা বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। শাসনতন্ত্রের মধ্যে তাঁদের ক্ষমতা ছাড়াও তাঁরা ভালো মাহিনা পেতেন। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হতে থাকলে এগুলিও কমতে থাকে। সুতরাং ওয়ালিওল্লা একদিকে মুসলিম আইনকে *হাদিসের* অধীনে নিয়ে এলেন এবং অন্যদিকে বিভিন্ন সূফি গোষ্ঠীকে গোঁড়া মতবাদের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। ঐদিক থেকে উনি সিরহিন্দের সৈয়দ আহমদের কাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীকে গোঁড়া ও পরম্পরাগত বিশ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসা সম্পূর্ণ করেন। বলাবাহুল্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাহ ওয়ালিওল্লা ছিলেন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামে নূতন ধারা এনেছিলেন, যার ফল ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner